বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৯/৪০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯

পাঁচ দশকের উন্নয়ন অভিযাত্রা: ধাঁধার অন্তরালে

শামসুল আলম*

১। বিশ্বনয়নে দেখা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে (২০২১) আন্তর্জাতিক মিডিয়া, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক-ভাবে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ, দেশীয় মিডিয়া ও বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের ৫০ বছরের অর্জন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভিডিও বার্তায় (২৬ মার্চ, ২০২১) বলেছেন, বাংলাদেশ সংস্কার ও উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির দ্রুতগামী সড়কে প্রবেশ করেছে। জার্মান মিডিয়া ডয়চে ভেলে (১৬ ডিসেম্বর, ২০২১) বাংলাদেশকে আখ্যা দিয়েছে উদীয়মান অর্থনীতির তারকা হিসেবে। এতে আরও বলা হয়েছে, স্বাধীনতার সময়ে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশের উপর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ডামাডোল, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা (১০ মার্চ, ২০২১) লিখেছে, শিশু দারিদ্র্য কমানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশের দিকে তাকানো উচিত। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (০৩ মার্চ, ২০২১) বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার 'বুল কেস' হিসেবে অভিহিত করেছে আর ডিপ্লোমেট ম্যাগাজিনের (১৫ মার্চ, ২০২১) মতে, বাংলাদেশ ৫০ বছরে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বিভিন্ন ফ্রন্টে দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে। বিশ্বখ্যাত ব্লুমবার্গ ম্যাগাজিন (০৫ জুন, ২০২১) শিরোনাম করেছে 'বাংলাদেশের উত্থান হচ্ছে (বাংলাদেশ ইজ অন দ্য রাইজ)' এবং ভারত ও পাকিস্তানের তাতে নজর দেয়া উচিত। বাংলাদেশের প্রতি রক্ষণশীল ভারতের মিডিয়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির তারিফ না করে পারেনি, যেমন টাইমস্ অব ইন্ডিয়া (৩০ মার্চ, ২০২১) শিরোনাম দিয়েছে বাংলাদেশ গত দশ বছরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতকে পেছনে ফেলেছে। হিন্দুস্তান টাইমস্ (২৪ অক্টোবর, ২০২০) বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্য বর্ণনা করেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণটি এসেছে বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর কাছ থেকে। তিনি বাংলাদেশকে জন্মের পর থেকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং বাংলাদেশের এই সফলতাকে অনেকে অনুমান করতে পারেনি। তিনি বিশেষত উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর একটি। বাংলাদেশের অর্থনীতির এই রূপান্তর বিশ্বের নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য উদাহরণ হতে পারে।

২। উত্থান প্রকৃতি

বাংলাদেশের ৫০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের পর্যালোচনা হতে একটা বিষয় স্পষ্ট আর সেটি হলো, বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য নিরসনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের (২০১৯) বাংলাদেশ দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনকে উদ্দীপনামূলক গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৯)। ২০০০ সালের পর হতে দেড় দশকে আড়াই কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার বাইরে চলে এসেছে। দারিদ্র্য

---

* লেখক একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

নিরসনে সকল খাতের অবদান আছে। দারিদ্র্য কমার পাশাপাশি মানব উন্নয়ন, পুঁজির বিকাশ, নারীর প্রজনন হার কমানো ও প্রত্যাশিত গড় আয়ুর বৃদ্ধি ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গ্রামীণ দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, গ্রাম মোট দারিদ্র্য হ্রাসে ৯০ শতাংশ ভূমিকা রেখেছে। অথচ এক সময় গ্রাম ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য পরিচিতি ছিল আমাদের কাছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে দারিদ্র্য বিবেচনায় বাংলাদেশ কেবল পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর চেয়ে এগিয়ে ছিল। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলামের ভাষায়, 'বাংলাদেশ অনুন্নত অবকাঠামো, স্থির কৃষি, দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যাযুক্ত ভঙ্গুর ও দুর্বল অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণ ও হারানো সুযোগের কারণে উদ্যম ও উদ্যোগ দুর্বল হয়ে পড়েছে' (পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৭৩)। তার সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগ হয় বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষ। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কী অবস্থা ছিল তা থেকে অর্থনীতির সার্বিক অবস্থার একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। বিনায়ক সেন (২০১৯) তার 'সাহিত্য ও অর্থনীতি: বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ' নিবন্ধে (সেন, ২০১৯) তা বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

> 'আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনার মতো যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল না সরকারের হাতে সেদিন। ১৯৭৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যেখানে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে সেই রিজার্ভের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলারে। দুর্ভিক্ষ যখন চলছিল, সেই ৩য় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রিজার্ভের পরিমাণ আরও কমে যায় ৪০ মিলিয়ন ডলারে।'

এক দশক আগেও বাংলাদেশের সাফল্যকে আকস্মিক ধরা হতো। শুরুতে প্রতিকূল পরিস্থিতি, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও সমজাতীয় আয়ের দেশের তুলনায় একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক অগ্রগতি অনেকের কাছে উন্নয়ন বিস্ময় (development surprise) বা উন্নয়ন গোলকধাঁধা (development puzzle) নামে পরিচিতি লাভ করে (আসাদুল্লাহ ও অন্যান্য, ২০১৪; মাহমুদ ও অন্যান্য, ২০০৮; বিশ্বব্যাংক, ২০১২)। একাডেমিসিয়ানদের বাইরেও একই ধরনের মত লক্ষ করা যায়। যেমন, বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে সামাজিক সূচকে অন্যান্য সমজাতীয় দেশের তুলনায় উন্নতি করতে পেরেছে তা প্রথম জানা যায় বিশ্বখ্যাত ইকোনমিস্ট পত্রিকায় (ইকোনমিস্ট, ২০১২)। এর কারণ মূলত বাংলাদেশের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, বরং আছে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। এর ফলে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। তদুপরি ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সালে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান স্বাধীনতার প্রথম দিককার হতাশাকে উসকে দেয়। তবে নব্বই দশকের পরবর্তী হতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই মৌলিক অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন, তা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায়নি। বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। শিশু মৃত্যু হার, ৫ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যু হার ও মাতৃমৃত্যু হারের ক্ষেত্রে নাটকীয় অগ্রগতি হয়, যা শুধু উনবিংশ শতকের শেষ দিকের জাপানের সাথে তুলনা চলে। এটা কিন্তু আয় বৃদ্ধির ফলাফল নয়। প্রবৃদ্ধিই যে সকল উন্নয়নের নিয়ামক–ওয়াশিংটন কনসেনসাসের এমন ধারণা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিপরীত। বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, কম মাথাপিছু আয় বা দরিদ্র হয়েও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

তবে গত এক দশকে সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমসাময়িক দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন উন্নয়ন বিশ্লেষকদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। বিশেষ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) বিভিন্ন সূচকে অর্জন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রতিফলিত করে। এরপর বিশ্বব্যাংকের নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের শ্রেণীতে পদার্পণ (২০১৫) এবং জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি হতে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের মতো যোগ্যতা অর্জন (২০২১) এবং সর্বশেষ জাতিসংঘ অনুমোদিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রগতি পদক প্রদান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম নিদর্শন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশি ধনী ছিল অথচ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন পাকিস্তানের চেয়ে ৫৬ শতাংশ বেশি (আইএমএফ ডেটাবেইজ, ২০২১)। এমনকি গত দুই বছর ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে বেশি ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ সামাজিক সূচকে যে অগ্রগতি বিগত দশকগুলোতে অর্জন করেছে, গত এক দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই ধরনের সাফল্য পেয়েছে। সারণি ১-এ একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ প্রান্তে ভারত ও পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোর সাথে বাংলাদেশের সূচকগুলোর তুলনা দেয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ প্রায় সব সূচকে এগিয়ে রয়েছে।

সারণি ১: বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক সূচকের তুলনা

সূচক	বছর	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	উৎস
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন)	২০২০	১৯৬১.৬	১৯২৯	১২৫৪.৮	আইএমএফ
মোট ঋণ জিডিপি (শতাংশ)	২০২০	৩৮.৯	৮৯.৬	৮৭.৫	আইএমএফ
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	২০১৯	২৫.৬	২৮.৩	৫৫.৭	বিশ্বব্যাংক
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	২০১৯	১৯.১	২১.৭	৪১.২	বিশ্বব্যাংক
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	২০১৯	৩০.৮	৩৪.৩	৬৭.২	বিশ্বব্যাংক
অপুষ্টির ব্যাপকতা (জনসংখ্যার হার)	২০১৯	৯.৭	১৫.৩	১২.৯	বিশ্বব্যাংক
খর্বকায় এর ব্যাপকতা (জনসংখ্যার হার)	২০১৯	২৮	৩৪.৭ (২০১৭)	৩৭.৬	জেএমই*
কৃষকায় এর ব্যাপকতা (জনসংখ্যার হার)	২০১৯	৯.৮	১৭.৩ (২০১৭)	৭.১ (২০১৮)	জেএমই*
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি (মোট হার)	২০২০	১১৯.৫	৯৯.৯	৯৫.৪৮ (২০১৯)	বিশ্বব্যাংক
প্রাথমিক জেণ্ডার সমতা সূচক	২০২০	১.০৯	১.০১	০.৮৮ (২০১৯)	বিশ্বব্যাংক
মোট প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)	২০১৯	৭২.৫৯	৬৯.৬৫	৬৭.২৭	বিশ্বব্যাংক
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক র‌্যাংকিং	২০২১	৭৬	১০১	৯২	কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
বৈশ্বিক জেন্ডার প্যারিটি সূচক র‌্যাংকিং	২০২১	৬৫	১৪০	১৫৩	ডব্লিউইএফ**
এসডিজি সূচক র‌্যাংকিং	২০২১	১০৯	১২০	১২৯	এসডিএসএন***

টীকা: *জয়েন্ট ম্যালনিউট্রিশন এসটিমেট (ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউএইচও), **ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, ***সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন নেটওয়ার্ক।

সারণি ১ হতে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, অপুষ্টির ব্যাপকতা হ্রাস, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, সাক্ষরতার হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, জেণ্ডার সমতা, মাথাপিছু আয় প্রভৃতি সূচকে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে। এর প্রতিফলন দেখা গেছে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ অনুমোদিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন নেটওয়ার্কের এসডিজি সূচকের র‍্যাংকিংয়ে, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের এই ধারাবাহিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কারণগুলো খুঁজতে একটু পেছনে যেতে হবে।

৩। ঘাত প্রতিঘাতের প্রবহমান অর্থনীতি

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৭৫ পরবর্তীকালে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-১৯৭৮) অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, দেশীয় বাস্তবতায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক-সমতাবাদী বণ্টন ও দারিদ্র্য হ্রাস। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা। একই সময়ে চীনে এক শিশুনীতি ও ভারতে বন্ধ্যাত্বকরণ নীতি চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। এই নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে নারীদের বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি পরামর্শ প্রদান করা হয়। এর ফলে নারী প্রতি জন্ম হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়; স্বাধীনতার সময়ের প্রায় ৭ থেকে কমে ২০১৯ এ ২.০১ এ নেমে আসে, যা উন্নত দেশের প্রতিস্থাপন হার ২.১ (ক্রেইগ, ১৯৯৪) এর চেয়েও কম। পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ১৯৭৬ সালের ৮ শতাংশ হতে ২০১৯ এ ৬৩ শতাংশে উন্নীত হয়। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে তা একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দেশেরই জনসংখ্যা ছিল ৬৫ মিলিয়ন। ২০২১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৫ মিলিয়ন আর পাকিস্তানের ২০০ মিলিয়ন। চিত্র ১-এ ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের উর্বরতার হার দেখানো হলো।

চিত্র ১: বাংলাদেশে নারীদের উর্বরতার হার (১৯৭২-২০১৯)

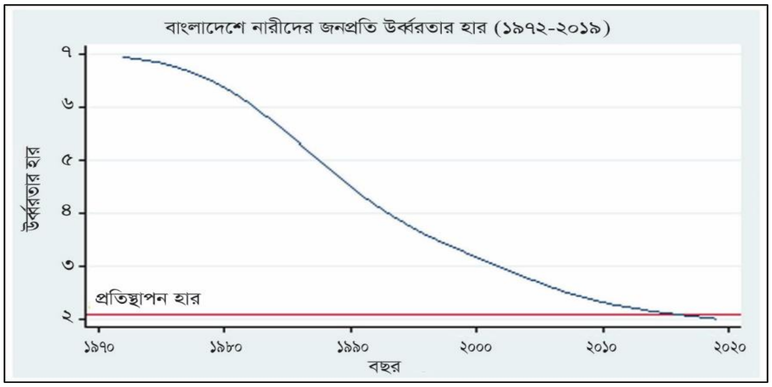

তথ্যসূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক।

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যার পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সূচকের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের শুরু স্বাধীনতার পর থেকে আর এর বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে আশির দশকে, যা অব্যাহত রয়েছে এখনো। এছাড়া নব্বই দশকে ব্যাপক হারে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধিও এ ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ এখন যে জনমিতিক লভ্যাংশ উপভোগ করছে তা বিগত শতকের ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকের জনসংখ্যা নীতির প্রতিফলন। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে সামাজিক পুঁজির উদ্ভব ঘটে তার মূল কারণ সরকারের দূরদর্শী নীতি। এর ফলে দলভিত্তিক ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। অনেক অর্থনীতিবিদ কাজ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে দারিদ্র্য নিরসন এবং সমৃদ্ধির কারণ হিসেবে ব্যাখা করেছেন (ইকোনমিস্ট, ২০২০)। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও সামাজিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মূলত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মূল্যবোধে প্রোথিত।

এটা সত্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘ বা মধ্য মেয়াদে চীন বা ভারতের মতো দ্রুত গতির ছিল না। স্বাধীনতার পুরো প্রথম দশকে বাংলাদেশে ২ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো ধারাবাহিক স্থিতিশীলতা, বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের পর হতে বাংলাদেশে প্রতি দশকে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে গত দশকে, যা নিচের চিত্র থেকে বোঝা যায়।

চিত্র ২: দশক ভেদে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

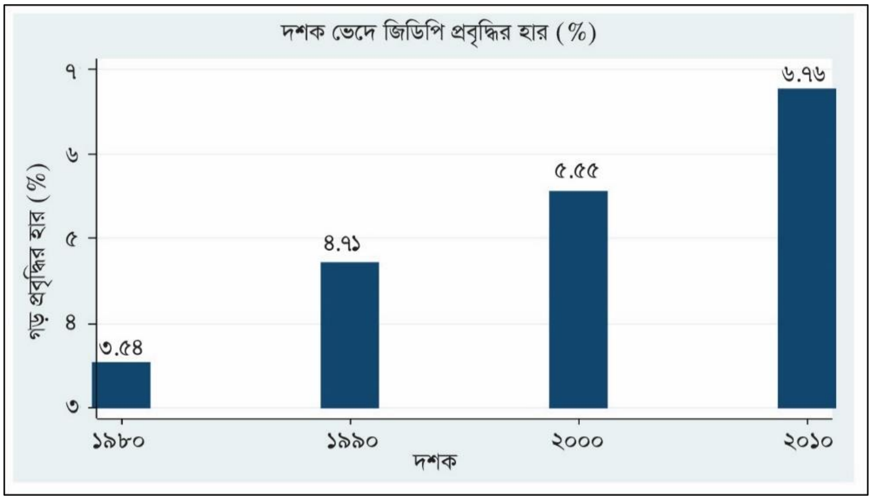

তথ্যসূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক।

এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির মূল কারণ হলো, শাসন কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারগুলো কিছুটা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে দেশের অর্থনীতিকে তাল মেলাতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮০-এর দশক থেকে জন্মহার হ্রাস, এই দশকের কাঠামোগত সমন্বয় নীতি (structural adjustment policy), আমদানি বিকল্প নীতি গ্রহণ, তৈরি পোশাক খাতের প্রসারে বন্ডেড ওয়্যারহাউজসহ অন্যান্য নীতিগত ও আর্থিক সুবিধা প্রদান, ১৯৯০-এর দশকের ওয়াশিংটন কনসেনসাস (১৯৮৯) এর আদলে ঋণদাতা সংস্থার চাপিয়ে দেয়া বাজার উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, কর কাঠামো সংস্কার, মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনীতির চালক হিসেবে কাজ করেছে। তবে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের প্রথমে বাংলাদেশের রাজনীতির উথাল পাথাল সময় অর্থনীতিকে অনেক প্রভাবিত করেছে। ১৯৮০-এর দশকে অর্থনীতির বদলে সে সময়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার দিকেই রাজনীতিবিদরা অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। সে কারণে প্রবৃদ্ধি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। তবে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে উঠে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। ২০১০ এর দশকে জিডিপির অনুপাতে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের পরিমাণ তুলনামূলক কমে যায়, যদিও রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে গত দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হতে পারে এ শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগে বিশ্বমন্দার ফলে বিশ্বব্যাপী চাহিদা কমে যাওয়া। তাছাড়া বিগত দশকের প্রথম দিকে বৈশ্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় কাঁচামালের আমদানি খরচ বৃদ্ধি পায়। তবে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সে কারণে গত দশকের জিডিপি প্রবৃদ্ধির বড় চালিকা ছিল বিনিয়োগ। বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর মূলে ছিল ডজনের বেশি মেগা প্রকল্প গ্রহণ এবং অর্ধশতকের বেশি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি। এছাড়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য কমে যাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ৩: বিগত তিন দশকে অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি

(রপ্তানি ও প্রবাসী আয় এবং শেষ দশকে মোট বিনিয়োগ)

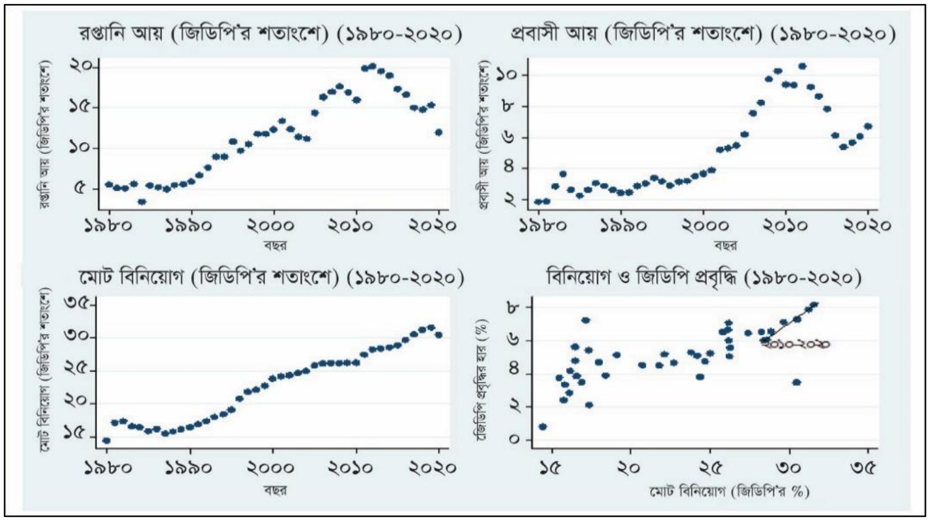

তথ্যসূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক।

৪। নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের কাল

একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা রেখেছে পরিকল্পনায় গুণগত পরিবর্তন। কৃষি প্রধান অর্থনীতি থেকে এখন শিল্প ও সেবা খাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের জিডিপির অর্ধেকেরও বেশি আসতো কৃষি থেকে অথচ এখন কৃষির অবদান মাত্র ১২ শতাংশ। অন্যদিকে শিল্পের অবদান ৮ শতাংশ হতে ৩৪ শতাংশ হয়েছে। তবে কর্মসংস্থানের বিচারে এখনো কৃষির অবদান (৪০ শতাংশ) অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। ফলে এক সময়ের দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশ এখন খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষযোগ্য জমি হ্রাস পেলেও চালের উৎপাদন পঞ্চাশ বছরে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু খাদ্যশস্য নয়, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকি, কৃষি গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারগুলো অসামান্য অবদান রেখেছে। এ ছাড়া তৃণমূল জনগণের উদ্যোক্তা মনোভাব ও প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার দক্ষতা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করেছে। গত দশকে সরকারের সুপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উত্থান হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার সময়ের উন্নয়ন দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সারণি ২-এ পঞ্চাশ বছরে কৃষির পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণি ২: বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছরে কৃষির বিবর্তন

বিষয়	১৯৭২-৭৩	২০১৯-২০	বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
চাষযোগ্য জমি	১০৬.০ লাখ হেক্টর	৭৯.০ লাখ হেক্টর	-২৫.৪৭
জনপ্রতি খাদ্যশস্য প্রাপ্যতা	৪৫৬ গ্রাম	৬৭৮ গ্রাম	৪৮.৬৮
চাল উৎপাদন	১.০৮ কোটি মে. টন	৩.৮৬৯ কোটি মে. টন	২৫৮.২৪
ভুট্টা উৎপাদন	৩.০ লাখ মে. টন	৫৪.০৩ লাখ মে. টন	১৭০১
সবজি উৎপাদন	২৯.০৮ লাখ মে. টন	১৮৪.৪৭ লাখ মে. টন	৫৩৪.৩৫
আলু উৎপাদন	৮.২৭ লাখ মে. টন	১০৯.১৭ লাখ মে. টন	১২২০.০৭
মৎস্য উৎপাদন (১৯৮৪-৮৫)	৭.৫৪ লাখ মে. টন	৪৩.৮৮ লাখ মে. টন	৪৮১.৯৬
দুধ উৎপাদন	১০ লাখ মে. টন	১.৬৮ কোটি মে. টন	১৫৮০
মাংস উৎপাদন	৫ লাখ মে. টন	৭৬.৭৪ লাখ মে. টন	১৪৩৪.৮
ডিম উৎপাদন	১৫০ কোটি	১ হাজার ৭৩৬ কোটি	১০৫৭.৩৩
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংখ্যা)	০১ টি	০৮ টি	৭০০

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ; পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, বিভিন্ন বছর)।

৫। উন্নয়নের স্বর্ণযুগ (২০১০-২০২০ দশক)

বিগত দশককে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশির ভাগই অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ এক ডজনেরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয় এবং স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার শর্ত দুইবার পূরণ করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের যত মাইলফলক ও অর্জন তা এই দশকে সম্পন্ন হয়েছে। এর মূলে রয়েছে উন্নয়নের নয়া জাতীয় পরিকল্পনা। বাংলাদেশে সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনার পর দুই বছর মেয়াদি অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব পায় বহুপাক্ষিক সংস্থার চাপিয়ে দেয়া নীতি যেমন-কাঠামোগত সমন্বয় নীতি, ওয়াশিংটন কনসেনসাস, বাছবিচারহীন নিয়ন্ত্রনহীনতার প্রতি অধিকতর আগ্রহ। এছাড়া সে সময়ে সামরিক শাসন থাকায় শাসকদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার দিকে নজর ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে তৈরি হলেও এতে তার কোনো মালিকানা ছিল না। কারণ এটি প্রকাশিত হয়েছিল বাস্তবায়নের শেষ বছরে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাত অধিক গুরুত্ব পেল এবং এটি ছিল মূলত বিনিয়োগ পরিকল্পনা। বস্তুত আশি ও নব্বই দশক এবং এই শতকের প্রথম দশকের উন্নয়ন পরিকল্পনা ওয়াশিংটন কনসেনসাস কিংবা পিআরএসপি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এসব মূলত কতগুলো নীতির সমষ্টি যেমন- বাজেট ঘাটতি কমানো, অর্থনৈতিক রিটার্ণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বাদ দেয়া, আর্থিক খাত উদারীকরণ, কর পদ্ধতির সংস্কার, বাণিজ্য বিধি-নিষেধ কমানো, বৈদেশিক বিনিয়োগের বাধা দূর করা, ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এসব নীতি আফ্রিকার বিভিন্ন দরিদ্র দেশ গ্রহণ করেছিল অথচ আমাদের পাশের দেশ ভারত, নেপাল গ্রহণ করেনি। এসব নীতি যেমন দেশজ বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করেনি, তেমনি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করেনি। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না, যা সংবিধানের ১৫(গ) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ সময়ে ছিল দুটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, কিন্তু এতে সরকারের কোনো মালিকানা ছিল না। এগুলো মূলত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের চাপিয়ে দেয়া কৌশল, যাতে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল না। এছাড়া এটি এমন সময়ে করা হয় যে সময়ে ওয়াশিংটন কনসেনসাস ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো রূপকল্প ২০২১ গ্রহণ করে। তারই আলোকে দশ বছর মেয়াদি প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ কী অর্জন করতে চায় তা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিকল্পনা জগতে 'প্যারাডাইম শিফট্' হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয় ও ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার রূপরেখা তৈরি হয়। এর মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে আছে নিরক্ষরতা দূর করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১০০ ভাগে বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ১৫ শতাংশে নামিয়ে নিয়ে আসা এবং ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাজেট ও পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে সংযুক্ত করা। এই পরিকল্পনার জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। এর আগে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মধ্যে তেমন সমন্বয় ছিল না। গত দশকের শুরুতে এই অসামঞ্জস্য দূর করে পরিকল্পনাকে জীবন্ত দলিলে রূপ দেয়া হয়। ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনার সাথে তাদের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এতে তাদের মধ্যে এক ধরনের মালিকানা তৈরি হয়, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবহিত করা হয়। এই সময়ের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পরিকল্পনার সাথে ফলাফলভিত্তিক কাঠামো প্রণয়ন, যা অনেকগুলো সূচকের সমষ্টি। ফলে পরিকল্পনা মধ্য ও শেষ মেয়াদে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় এবং সে অনুযায়ী সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনার সাথে সুনির্দিষ্ট সংযোগ থাকার ফলে সম্পদের সুষম ও কার্যকর ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্য দিয়ে 'এক নয়া জাতীয় পরিকল্পনা যুগের' সূচনা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো, দেশজ উদ্ভূত, জাতীয় সত্তা তাড়িত, জাতীয় নেতৃত্বের

সরাসরি তত্ত্বাবধানে এটি প্রণীত। আশির দশকের কাঠামোগত সমন্বয় নীতি, নব্বই দশকের ওয়াশিংটন কনসেনসাস ও একবিংশ শতকের প্রথম দশকে পিআরএসপির ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় দশকের শুরুতে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন পুঁজিকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুগের সূচনা হয়। এই নয়া জাতীয় পরিকল্পনার ফলেই বাংলাদেশ নয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করে। ফলে গত দশকে প্রবৃদ্ধির বিরামহীন দ্রুত উল্লম্ফন ঘটে। প্রবৃদ্ধির বিচারে গত দশকে বাংলাদেশের চেয়ে একমাত্র চীনই এগিয়ে ছিল। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কীভাবে লাফিয়ে বেড়েছে তা নিচের চিত্র থেকে বোঝা যাবে।

চিত্র ৪: ২০০৯ সাল হতে মাথাপিছু গড় আয়ের উল্লম্ফন

তথ্যসূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক।

৬। শেষকথা: স্বপ্নতাড়িত বাংলাদেশ

সামাজিক সূচকে অনেক আগেই ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলা বাংলাদেশ এখন মাথাপিছু আয়েও তাদের পেছনে ফেলেছে। কাজেই বাংলাদেশের উন্নয়নকে বিস্ময়, গোলক ধাঁধা বা দৈব বলে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। এটা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের ধারাবাহিক অদম্য ও পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টার ফসল। এক্ষেত্রে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্য অর্জনের পর সরকার বিশ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধশালী দেশের পথে এগিয়ে যাবে। ২০৪১ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন যাত্রা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুচিহ্নিত করা হয়েছে। তখন গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসনের অধীনে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষেই সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমর্থ হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

সেন, বিনায়ক। (২০১৯)। সাহিত্য ও অর্থনীতি: বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ। *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*। ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২৬।

Asadullah, M. N., Savoia, A., & Mahmud, W. (2014). Paths to development: Is there a Bangladesh surprise?. *World Development*, *Elsevier*, *62*, 138-154.

Craig, J. (1994). Replacement level fertility and future population growth. *Population Trends*, Winter (*78*), 20-22. PMID: 7834459.

Economist. (2012, November 3). *Bangladesh and development: The path through the fields*. https://www.economist.com/briefing/2012/11/03/the-path-through-the-fields

Economist. (2012, November 3). *Bangladesh: Out of the basket*. https://www.economist.com/leaders/2012/11/03/out-of-the-basket

Economist. (2020, September 5). Hard work and black swans: Economists are turning to culture to explain wealth and poverty. https://www.economist.com/schools-brief/2020/09/03/economists-are-turning-to-culture-to-explain-wealth-and-poverty

Mahmud, W., Ahmed, S., & Mahajan, S. (2008). Economic reforms, growth, and governance: The political economy aspects of Bangladesh's development surprise. Commission on Growth and Development Working Paper, No. 22. World Bank, Washington, DC.

Planning Commission. (1973). *The first five-year plan (1973-1978)*. The Government of the People’s Republic of Bangladesh.

World Bank. (2019). Bangladesh poverty assessment: Facing old and new frontiers in poverty reduction (World Bank Publications - Reports 32755). The World Bank Group. Washington DC.

World Bank. (2012). Bangladesh: Towards accelerated, inclusive and sustainable growth–opportunities and challenges (Report 67991). Poverty Reduction and Economic Management Unit, South Asia Region.